একটি সাহিত্য নির্ভর বাংলা পত্রিকা
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত
পঞ্চম সংখ্যা, জুন-জুলাই ২০১৫

প্রবাসী বাংলা পত্রিকা

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর

জাহানারা ইমাম

Narrow jaw treatment by orthodontist Dr Andrew Chang

তোফাজ্জাল সরকারের সৈয়দ মুজতবা আলি

ঈদদুল ফিতর - ২০১৫

বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেট সিরীজ-২০১৫

মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ

বাংলা শিখুন বাংলা পড়ুন বাংলা চর্চা করুন

Interest Free

Land for Sale - Brisbane

A Chance to Escape Interest and Mortgage

Qartaba Housing Project

Bundamba, Brisbane (QLD)

Interest Free Instalments

Flexible Payment Options

Call +612 9627 3073

We are please to commence the ***Third Phase of Interest Free Housing Project*** in booming suburb of Brisbane (Bundamba).

- ✓ Lot sizes from 420 sqm to 550 sqm
- ✓ Surrounded by well-established areas
- ✓ A variety of shops lining the Brisbane Road, nearby Swim Centre, Park and Hospital.
- ✓ Close to Train station.
- ✓ 25-30min drive to Brisbane CBD
- ✓ Quick Access to Warrego and Cunningham Hwy.
- ✓ Few minutes' drive to Schools, College, TAFE and University.
- ✓ Close to Industrial and Business Park.

For More Information:

Call: +612 9627 3073, 0437 100 237
0412 421 596 , 0400 382 227

E-mail: info@qartabahomes.com.au
Website: www.qartabahomes.com.au

Expected Timeline

- ✓ Bookings commence JAN 2015
- ✓ Expected delivery in 2017 - 2018

A project of
QARTABA HOMES
Interest Free Housing Solutions

প্রধান সম্পাদক: প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন সরকার

সম্পাদক: ডা: তামান্না পারভীন

সহ- সম্পাদক: ফারদিন ফেরদৌস
মিথিলা জাহিন
সারিতা আলম

প্রকাশনা সম্পাদক: শেরওয়ান জামান

ই- মেইল: tparvin2@yahoo.com.au

১৫ মেপল গ্রুভ কেলিভিল রীজ NSW 2155

তোফাজ্জল সরকার

তামান্না পারভীন

প্রবাসী বাংলা পত্রিকা

সম্পাদকীয়:

রোজা-ঈদ এল আবার চলেও গেল। এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্যে দিয়ে মুসলমানগন সর্বক্ষেত্রে সংযম পালন করেছেন। রহমত, মাগফেরাত, নাজাতের মাস ছিল রমজান। এজন্য প্রায় সবাই নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, জেকের আসকরে সময় ব্যয় করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে রোজায় দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকলেও রাত্রের বেলায় সেটা পুষিয়ে নিয়েছেন তো বটেই আরও বেশী বেশী খাওয়া দাওয়া করেছেন। এফতার পার্টির সংখ্যা অগণ্য। আমার এক বন্ধু বললেন তিন রোজার পর থেকে ছাব্বিশ-সাতাশ রোজা পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন চারটে করে হলে এফতার পার্টির সংখ্যা দাড়ায় ৯০ এর কাছাকাছি। এত পার্টি, এত খাওয়া দাওয়া সংযমের পরিপন্থী হয়ে যায় না কি! ব্যাপারটা ভেবে দেখা দরকার। ঈদ মুসলমানদের বড় উৎসব। চাঁদ রাতে যখন বেজে ওঠে "মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ/ তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানি তাগিদ" তখন আসলেই মন খুশীতে ভরপুর হয়ে ওঠে। নতুন জামা কাপড় পরে, ফিরনি- সেমাই, পোলাও-কোরমা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে খুশীর ঈদ ঘরে ঘরে আনন্দ বয়ে আনে। গরীব, দুখী মানুষেরাও ধনবানদের সাহায্য-সহযোগিতায় আনন্দের ভাগ পান। ভুলে যেতে ইচ্ছা করে "জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসেনি নিদ/ আধমরা সেই কৃষকের ঘরে এসেছে আজ ঈদ।" অবশ্য কৃষক এখন 'হর রোজ রোজার' অবস্থা কাটিয়ে উঠে অনেক সচ্ছল। যদিও বিত্তবানদের বিলাস-বৈভব বিত্তহীনদের গায়ে জ্বালা ধরায়। তবে ঈদের খুশীতে এই সামাজিক বৈষম্য অনেকটাই চাপা পড়ে যায়।

ঈদের খুশীর আগেই একটা বড় খুশীর খবর এসেছে, বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের কাতারে ওঠে এসেছে। ছিলাম নিম্ন আয়ের দেশ, এখন নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ; নিম্ন শব্দটি এখনও মনপসন্দ নয়। তবে সবাই আশা করছে এই অপছন্দ শব্দের হাত থেকে ২/৩ বছরে রেহাই পাওয়া যাবে। বিশ্ব ব্যাংক কাকে, কি শর্তে, কত ধার দেবে তা ঠিক করার জন্যে বিশ্বের দেশগুলোকে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন আয়ের দেশ হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করে। ১হাজার ৪৫ডলার থেকে ১২ হাজার৭৩৫ ডলার জাতীয় আয় হলে দেশটি মধ্য আয়ের দেশ বলে বিবেচিত হয়। মধ্য আয়ের শুরু এবং শেষের ভিতরের ফাঁকটা অনেক বড় বিধায় এখানে আবার দুটি উপশ্রেণী- উচ্চ-মধ্য আর নিম্ন-মধ্য করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৮০ডলার (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে ১হাজার ৩১৪ ডলার) অর্থাৎ নিম্ন আয়ের সামান্য ওপরে আছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় ধরে রাখতে না পারলে আবার ডিমোসন হতে পারে, যেমন হয়েছে দক্ষিন সুদানের। নিম্ন মধ্যম আয়ের তালিকায় ঢুকে যাওয়ায় বাংলাদেশের সুবিধা হল দেশের মর্যদা বেড়েছে, এখন দেশকে আর অবহেলার চোখে দেখবেনা বিশ্ব। ধার দিতে আর কুণ্ঠিত হবেনা অনেক দেশ, ধরে নেয়া হবে বাংলদেশের শোধ দেয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। তবে অসুবিধাও অনেক আছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বেশ কিছু সুবিধা পেত, সেগুলো হারাবে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা সহজ শর্তে কম সুদে যে ধার দিত তা হয়ত আর পাবেনা, কঠিন শর্ত অরোপ করা হতে পারে। তবে এখনও এ অসুবিধায় পরবেনা বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয় আরও বেড়ে ১হাজার ২০০ ডলার হলে তখন হয়ত সুবিধা থেকে বাদ পড়ে যাবে। কি আর করা যাবে! কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়, এটাই নিয়ম। তবু মর্যাদা অনেক বড় ব্যাপার; আমরা মর্যাদাশীল জাতি হতে চাই, মধ্য আয়ের দেশ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জাহানারা ইমাম

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ

(পুর্ব প্রকাশিতের পর)

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশে এযাবৎ যত বই লেখা হয়েছে, এ বইটি সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মানবিক। কেবল আমাদের নয়, পৃথিবীর সাহিত্যেও এমন বই বিরল। এ্যানা ফ্রাংকের ডায়রি এই বইয়ের প্রেরণা হিশেবে কাজ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওই বইয়ের চেয়ে এই বই অনেক গভীর, ব্যাপ্ত, তলদেশবহুল। যুদ্ধধৃত দৈনন্দিন জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি এই বইয়ে একটা গোটা জাতির রক্তাক্ত হৃদয়কে দেখা যায়। যে বেদনার ভেতর দিয়ে একদিন বাংলাদেশের উত্থান ঘটেছিল, যা আজ আমরা ভুলে গেছি, একজন বিপর্যস্ত গৃহবধূর করুণ জীবনের ভেতর সেই দেশ ও দুঃখ এই বইয়ে পুরোপুরি প্রতীকায়িত হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো এই বইটিও অনন্য। 'একাত্তরের দিনগুলি' আগামীদিনের বাঙালি জাতির কাছে জীবন্ত মুক্তিযুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকবে। আরেকবার তিনি জেগে ওঠেন পঞ্চান্ন বছরের দিকে– ক্যানসারে আক্রান্ত হবার পর। দরজার পাশে নিশ্চিত মৃত্যু তাঁর সহজাত জীবনবাদিতাকে আরো দুর্জয় করে তোলে। যে পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর হাতে শর্তহীন আত্মসমর্পণ করে, সেই পরিস্থিতিতে জীবনের অবশিষ্ট প্রতিটি মুহূর্তের ভেতর পরিপূর্ণভাবে বাঁচার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। 'ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস' বইয়ে তাঁর অসাধারণ জীবনীশক্তি দেখে অবাক হতে হয়। এমন শান্ত নির্লিপ্তভাবে তাঁর ক্যানসার হওয়ার ঘটনাগুলোকে গুছিয়ে এক এক করে আমার কাছে একদিন বর্ণনা করেছিলেন যে তাঁর সেই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায় আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় নীরব থাকলে মানুষের হৃদয় সবচেয়ে বেশি করে বেজে ওঠে, তা তিনি জানতেন। 'একাত্তরের দিনগুলি'তে রুমীর চিরবিদায়, পীরের হঠকারিতা, শরীফ সাহেবের মৃত্যু– এমনি নীরবতার ভেতর দিয়ে, ছোট্ট পরো। ইশারায় তুলে ধরা হয়েছে বলেই তা স্মৃতি থেকে হারায় না। স্বামী-সন্তান একাত্তরেই হারিয়েছিলেন তিনি। একমাত্র জীবিত সন্তান দেশান্তরিত। সামনে মৃত্যু। সব হারিয়ে তাঁর জীবনগ্রহ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। একাত্তরে তাঁর মতো সারা জাতির হারানো প্রিয়-পরিজনদের অন্যায় হত্যার বিচারের দাবিকে এগিয়ে নেবার বিশ্রামহীন সংগ্রামে তিনি প্রদীপের মতো জ্বলতে থাকেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাস্তব রাষ্ট্র হিশেবে পাকিস্তানের পতন ঘটে। কিন্তু জাতির

হৃদয়ের ভেতরে যে পাকিস্তান এতদিন বেঁচে ছিল, এবার প্রয়োজন পড়ে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের। এই পাকিস্তানই আসল পাকিস্তান। তাই এই যুদ্ধ সর্বাত্মক। একাত্তরের রাজাকার-আলবদরদের উত্তরাধিকার থেকে জন্ম নেওয়া কট্টর বা কোমলপন্থী কোটি কোটি মানুষের এ এক দুর্ভেদ্য বিশাল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ আমাদের নিজেদের হৃদয়ে ও বাইরে। জাহানারা ইমাম এই যুদ্ধের অবিসংবাদী নায়িকা। এই নায়িকা পঞ্চাশের দশকের 'ঢাকার সুচিত্রা সেন' নন, কিংবা যাঁর মতো তিনি হতে চাইতেন সেই কিংবদন্তির নায়িকা সুচিত্রা সেনও নন– ওই দুজনের চাইতেও তিনি বড়। জাহানারা ইমাম এই জাতির উদার নিরপেক্ষ প্রগতিশীল যাত্রার প্রথম ও প্রধান সাংস্কৃতিক নায়িকা। সবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা কয়েক বছর আগে তাঁর বাড়িতে, তাঁর মুখে ক্যানসারের দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের পর। তখন তাঁর দিকে তাকানো যায় না। জিভ ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট অস্বাভাবিক, মুখ ক্লিষ্ট, কথা জড়ানো। বুকের ভেতর একটা মূক কষ্ট টের পেলাম। তাঁর বিগত দিনের সেই অম্লান মুখশ্রী আমার চোখের চারপাশে হাজারো রঙিন ছবির মতো ঘুরে বেড়াত লাগল– সেই ছবির শোভাযাত্রা থামানো যায় না। আহা, এই সেই ঢাকা শহরের এককালের সুচিত্রা সেন, পঞ্চাশ দশকের এই রাজধানী শহরের অনবদ্য তিলোত্তমা! তাঁর সঙ্গে ঘণ্টা-দুই কথা হল। দেখা হতেই বললেন, 'দেখেছেন কেমন মা-কালী হয়ে গেছি।' সহজ সাবলীলভাবে বললেন তিনি। হ্যাঁ, সত্যিই মা-কালী। জিভ ঝুলে থাকা মা-কালী। ছেলেবেলা থেকেই আমি স্নায়বিকভাবে দুর্বল। জীবনের পতনকে আমি সহ্য করতে পারি না। বার্ধক্য থেকে পালিয়ে তাই আমি চির-তারুণ্যের সহচর হয়ে থাকতে চাই। কেবলই জরা-মৃত্যুহীন জীবনকে খুঁজি। জীবনের দুই বিপরীত মেরুকে পাশাপাশি দেখার শক্তি আমার নেই। পরিণত মানসিকতার চূড়াকে স্পর্শ করা তাই আমার হল না। মৃত্যু দেখলে এক অশুভ ত্রাস আমার স্নায়ুতন্ত্রীকে অধিকার করে। অন্ধকার দেখলে আমি ভয় পাই। সারা পৃথিবীতে তাই আমি দেখতে চাই আলো, সকালবেলার মতো কচি পেলব উজ্জ্বল একচ্ছত্র আলো। জাহানারা ইমামকে দেখেই আমি ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে উঠতে থাকি। বারে বারে আমার সামনের ওই মুখটিকে ভুলে থাকতে চাই। তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচার কথা মনে হয়। কেন দেখতে হল এ দৃশ্য? এ দৃশ্য অন্যায়, অসহ্য, নির্বিবেক। মানবিক মর্যাদার জন্যে অবমাননাকর! এই কি মানবজন্মের নিয়তি? কেন এমন হয়? বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে ঝুলন্ত-জিহ্বা মা-কালী হয়ে যেতে হয় ? অথচ কত সহজভাবে জাহানারা ইমাম বললেন কথাটা! যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি আমাকে রাস্তা থেকে বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে

গিয়েছিলেন একদিন, ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দভাবে। যেন তাঁর নয়, অন্য কারো জীবনে ঘটেছে ঘটনাটা। যেন তাঁর অব্যাহত সুখের পৃথিবীতে ভালোমন্দ কিছুই ঘটে নি, ঘটে থাকলেও যা ঘটেছে সব তাঁর পরিচিত, প্রত্যাশিত। এই নির্লিপ্ত পরিতৃপ্ত আনন্দোজ্জ্বল জীবন আমার ভেতরে কোথায়? কিন্তু বীণাপাণিকে কেন একদিন এভাবে রক্ত-জিহ্বা মা-কালী হয়ে যেতে হয়? 'বাণীরূপেণ সংস্থিতা'কে 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'? প্রত্যেক জাতির জীবনে একেকটা সময় আসে যখন তার বুদ্ধি বিবেক প্রজ্ঞা ধর্ম সব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্রেরা অশুভের দর্পিত আস্ফালনকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তখন বীণাপাণিকে পদ্মাসন থেকে নেমে খড়্গধারিণী রণরঙ্গিনী হতে হয়। শারীরিক ও মানসিকভাবেই তা তিনি হয়েছিলেন। আমরা তরুণ বয়সে তাঁর বীণাপাণি রূপ দেখেছিলাম, পরিণত বয়সে তাঁর বিবৃত রণরঙ্গিণী চণ্ডীকে।

২ – প্রথমদিন তাঁর সঙ্গে আমার যে-তর্কের সূত্রপাত হয়েছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার সামনাসামনি যত দেখা হয়েছে, টেলিফোনে কথা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কথা শুরু না-হতেই আমাদের দ্বন্দ্ব বেধে যেত– তারপর সেই উষ্ণ তীব্র আনন্দ-মধুর বিতর্ক নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলত। ঝগড়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেই আমরা কেবল প্রসঙ্গে ছেদ টানতাম। ভিন্নমতাবলম্বীদের ব্যাপারে আমি চিরকালই শ্রদ্ধাশীল। যে আমার থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সে আমার বন্ধুর অধিক বন্ধু। তাঁর আলাদা চাউনি আমাকে আলোকিত করে। চেতনায় নতুন রঙ ধরায়। আমার অসম্পূর্ণ অস্তিত্বকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। নানান জাতের গাছ যেমন একটা উদ্যানকে সম্পন্নতা দেয়, নানারকম মতবাদ তেমনি মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করে। এ মতবাদ সংখ্যায় যত বাড়ে তত ভালো। এজন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঘোষণাপত্রে আমরা বারবার জানিয়েছি : আমাদের শক্তিমান মতপার্থক্যই আমাদের শক্তি। জাহানারা ইমামের সঙ্গে আমার যে অন্তহীন তার্কিকতা চলত তার কারণ এ নয় যে সিদ্ধান্তের জায়গায় আমরা খুব একটা আলাদা ছিলাম। অনেক সময় দেখা যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দুজনে ভিন্ন ভাষায় হয়তো একই কথা বলে চলেছি। আমাদের ভেতর যা আলাদা ছিল তা হল তাকাবার ভঙ্গি। তিনি আশাবাদীর চোখে পৃথিবীকে দেখতেন, আমি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। এই বিষণ্ণতাকে তিনি বরদাস্ত করতেন না। তাঁর কাছে এ ছিল জীবনবিমুখতারই প্রতীক।

একদিন তর্কের সময় তিনি আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদের সেই ধ্রুপদী গল্পটা তুললেন। বললেন : ধরুন একটা গ্লাসের অর্ধেকটা পানিতে ভরা। আশাবাদী বলবেন, আধগ্লাস পানি আছে। নিরাশাবাদী বলবেন, আধগ্লাস পানি নেই। সত্য কোন্‌টা? কোন্‌টা বড়? আমি বলেছিলাম : সত্য হিশেবে বড় দুটোই। কিন্তু সত্য দেখলে এখানে চলবে না। আমাদের দেখতে হবে ওই দুই সত্যদ্রষ্টাকে। যে বলবে আধগ্লাস পানি আছে, সে আমার মতে, স্বপ্নহীন পাথুরে মানুষ। সে যতটুকু পেয়েছে, ততটুকুকেই কেবল চিনেছে। তাতেই তৃপ্ত হয়ে রয়েছে। তাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি এগোচ্ছে না। কিন্তু নৈরাশ্যবাদী এদিক থেকে আশাবাদীর অধিক আশাবাদী। 'আধগ্লাস পানি নেই' সে বলছে কেন? বলছে এজন্যে যে সে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছিল পুরো গ্লাস, তাই আধগ্লাস পেয়ে সে বিমর্ষ। এই মানুষ কল্পনাসম্পন্ন, স্বাপ্নিক এবং অতৃপ্ত। তাঁর আত্মার ক্রন্দন গ্লাসের ওই বাকি অর্ধেককে পূর্ণ করার জন্য। এই নৈরাশ্য একটা বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক ব্যাপার। এটাই আসল আশাবাদ। একে 'ভেঙেপড়া' ভাবলে ভুল হবে। জীবনকে আমরা ভালোবাসি বলেই আমাদের ভেতর মৃত্যুবিষণ্নতা আসে। এই বেদনাকে কি আমরা জীবনবিমুখতা বলতে পারি? নাকি জীবনের চেয়ে বড় জীবনের জন্য এ এক শক্তিমন্ত আকুতি? বিষণ্নতা, মানসিক ভারসাম্যের প্রয়োজনই, আমাদের পরিপূর্ণ জীবন উপভোগের দিকে তাড়িয়ে নেয়। আমার ধারণা, বিষণ্নতা এবং বিষণ্নতা-রোগকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সেই বিতর্কের পর্ব চিরদিনের মতো শেষ হয়েছে। ওই প্রদীপ আর জ্বলবে না। আমার বাসা উত্তরায়, বিমানবন্দরের ওপারে। তাঁর মৃত্যুর দিনকয়েক পরে কাগজে দেখলাম জাহানারা ইমামের মরদেহ আমেরিকা থেকে ওইদিনই বিকেল চারটায় ঢাকা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবে। আমার যাবার আগ্রহ ছিল, শক্তি ছিল না। আগেই বলেছি মৃত্যুকে আমি সহ্য করতে পারি না। মৃতের মুখ দেখলে জীবন আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও আমি সম্ভবমতো এড়িয়ে চলি। যে মানুষ একদিন আমাদের সঙ্গে নিশ্বাস নিয়েছে, সুখে-দুঃখে দোসর হয়ে বেঁচেছে, প্রাণবন্ত হুল্লোড়ে আসর মাতিয়েছে, সে মানুষটা শক্ত নীরক্ত হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে আছে– এই দৃশ্যে আমার কী দরকার? সে তো সেই জীবন্ত মানুষটি নয়। যদি তার মৃত্যু হয়েই থাকে, সে থাক আমার কাছে খবরের কাগজের হারিয়ে-যাওয়া দশটা নির্বিকার তথ্যের মতো। আমার স্মৃতিতে সে বেঁচে থাক চির-তারুণ্যময় উজ্জ্বল এক পৃথিবীর অম্লান বাসিন্দা হয়ে। তাঁর মৃত্যু দিয়ে আমি কী করব? এই মৃত্যু-চিহ্নিত পৃথিবীতে যে-কথাটুকু শেষপর্যন্ত সত্য, তার নাম তো জীবন। জাহানারা ইমামের মরদেহ আসার সময়টা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিকেলে কাজ থাকায় শহরের উদ্দেশে বেবিট্যাক্সিতে রওনা হয়েছি, বিমানবন্দরের সামনে এসে অজস্র মানুষের এক বিপুল শোভাযাত্রার সামনে পড়তে হল– জাহানারা ইমামের কফিন ট্রাকে করে এলিফ্যান্ট রোডের সেই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শোভাযাত্রায় অনেক পরিচিত বন্ধুদের মুখ দেখলাম। আমার বেবিট্যাক্সি জনতার পাশ দিয়ে কোনোমতে জায়গা করে এগিয়ে চলেছে। মিছিলের সামনে জাহানারা ইমামের লাশবাহী ট্রাক। ট্রাকের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর কফিনটা চোখে পড়ল– কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা– ওপরে অজস্র ফুল আর ফুলের তোড়া। কফিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁকে শেষ বিদায় জানালাম। কেবলি মনে হতে লাগল সেই উজ্জ্বল চোখ, প্রতিভা আর দুর্বার জীবনবাদিতা কফিনের ভেতর এখন কী নির্বিকার, প্রত্যুত্তরহীন।

একটা ভারী কষ্ট গলা অব্দি উঠে বুক চেপে বসে রইল। আমার চোখ ছাপিয়ে পানি টলমল করে উঠল, কিন্তু মাটিতে পড়ল না। আমরা এখন আর কাঁদি না। বয়সের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি, যে দুঃখের অশ্রু একবার মাটিতে পড়ে, সে দুঃখকে আমরা হারিয়ে ফেলি।

দুরের সকাল

(ইউ লাব স্কুলের ৫০ বছরপূর্তি)

নাজমুল আহসান শেখ

আমার মনে নেই, আমার স্কুল জীবনের প্রথম দিনের কথা, তবে মনে আছে যে ১৯৬৬ সালের কোন এক দিন সকালে রাশিদা জামান আপা (উর্মির আম্মা) আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এবং আমার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা দেখতে পেয়ে ইউ ল্যাব' এ ভর্তি করেছিলেন। তার ঠিক এগারো বছর পর কাকতালীয় ভাবে আমার স্কুল জীবনের শেষ ক্লাস' টিও ছিল রাশিদা জামান আপার! এই এগারো বছরের মধ্যে আমার সুপ্ত প্রতিভা আর বিকশিত না হয়ে কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়?

আমাদের সাথে কে জি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল আমার অনেক বন্ধু যেমন; জামিল, মিজান, রেজা, আশরাফ, ইউনুস, রোমেল, সিদ্দিক, ইফতেখার, আমিনুর, রুমানা, উর্মি, সুমনা, তুলি এবং আরো অনেকে যাদের নাম এই মূহুর্তে মনে করতে পারছিনা বলে দুঃখিত। আমদের ক্লাস হতো আই, ই, আর এর এক তলায়। তখন আই, ই, আর এ অনেক মোটা মোটা এমেরিকান এডভাইসার ছিল, তারা শেভ্রলে গাড়ি করে আসা যাওয়া করতো। তাদের মধ্যে মিস্টার কফি ছিলেন সবচেয়ে হেভী! আমাকে কে একজন বলেছিল যে, মিস্টার কফি গাড়ি' তে বসলে গাড়ির চাকা ফেটে যাবে, তাই আমি আই, ই, আর এর পিছনে যেখানে তাদের গাড়ি পার্ক করা থাকতে সে দিকে তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে থাকতাম, চাকা ফাটার সেই বিরল দৃশ্য দেখার জন্য।

নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা আপা ছিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল। খুবই ভাল, কিন্তু আমরা উনাকে ভয় পেতাম। আরো ছিলেন সাদেক স্যার, রউফ স্যার, নুরুদ্দীন স্যার, বেলাল বেগ স্যার (পরবর্তীতে টি ভি প্রযোজক), আদম আলী স্যার, তাহের স্যার, ভৌমিক স্যার আর নজরুল ইসলাম মন্ডল স্যার। গানের আপা (মেঘলার আম্মা) আর রাশিদা জামান আপা' তো ছিলেনই। এই বেলাল বেগ

স্যারের আশীর্বাদে আমিও টি ভি' তে গিয়েছিলাম স্কুলের কিছু ছাত্রের সাথে কোন এক অনুষ্ঠানে আংশগ্রহন করতে। লাকি মি! আর মনে মনে ভাবতাম সত্যজিত রায় আমদের টিচার হলে কতো ভালো হতো! তখন সবেমাত্র মহসীন হল ও জিন্নাহ (সূর্যসেন) হল মাটির নীচ থেকে মাথা তুলতে শুরু করেছে। আমারা প্রতিদিন সকালে উল্কা' (ঢাকা চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেইন) কে বিদায় দিয়ে, রেল লাইনের উপর রাখা তামার এক পয়সা কে বড় করার পর, লাইন পার হয়ে কাটাবনের ঘোড়ার ঘরের ঘোড়া দেখার পর স্কুলে এসে পৌছতাম। তখন ছিল পাকিস্তান আমল। আমরা পাক সার জামিন সাদ এর পর পাকিস্তান জিন্দাবাদ গান তারস্বরে গাইতাম আর ভৌমিক স্যারের কমান্ড অনুযায়ী এক দো তিন চার এর সঙ্গে সঙ্গে পিটি করতাম।

সালের ২৫ শে মার্চ রাত্রে বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যরা আমাদের প্রিয় সাদেক স্যার' কে গুলি করে হত্যা করে। সাদেক স্যার' এর কবর ব্রিটিশ কাউন্সিলের পাসের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারের গেটের পাশে অবস্থিত।

১৯৭১ দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে স্কুলে এসে দেখি এক ' এলাহী ব্যাপার' । আই, ই, আর এর এসেম্বলী হলে ইন্ডীয়ান আর্মি হাজার হাজার অস্ত্র রেখেছে, মাইন, এস, এল, আর, এমনকি মেশিন গান! আর মহসীন হলের মাঠে পরিত্যাক্ত পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক। আমরা টিফিনের সময় ট্যাংকে উঠতাম! এর মধ্যে সিদ্ধান্ত হলে আমদের স্কুল আই, ই, আর থেকে নতুন বিল্ডিং' এ মুভ করবে। আমরা সবাই আমদের চেয়ারগুলি নিয়ে নতুন বিল্ডিং' এ মুভ করলাম।

আই, ই, আর বিল্ডিং' এর নিচে অনেক কুকুর থাকতো আর আই, ই, আর বিল্ডিয়ের তিন তলার শেষ প্রান্তে ছিল এক কঙ্কাল, যা প্রতিদিন একবার না দেখলে পেটের ভাত হজম হত না! আমরা আই, ই, আর এর ক্যান্টিন থেকে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সাথে সমুচা আর চপ কিনে খেতাম। সব মিলিয়ে আই, ই, আর ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। ৬৯ এর গন- অভ্যুথ্যান আমরা চোখের সামনে দেখেছি। আরও দেখেছি প্রজেক্টারে ' মুনার ল্যান্ডিং"!৭০ সালেএ দিকে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়; এহসান, সাব্বু, রবিন এবং আরো কিছু বন্ধু। নতুন দেশ আর নতুন বিল্ডিংএ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি স্কুলে আসি নাই। মার্চ পর্যন্ত কয়েক দিন বাদে। ১৯৭১

এমন সময় আসলো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংবাদ, আমরা সবাই ' অটো প্রমোশন' পেয়ে ক্লাস সিক্সে উঠে যাবো পরীক্ষা ছাড়া। আমরা সমস্বরে চিৎকার দিলাম, ' জয় বাংলা' বলে। মনে হলো, এই জন্যই তো দেশ স্বাধীন করেছি, স্বাধীনতার সুফল আমদের কাছে অলরেডী পৌছতে শুরু করেছে।১৯৭২ সালে আমাদের স্কুলে প্রথম এবং শেষ বারের মত স্কুল সংসদ নির্বাচন হয়! ক্লাস সিক্স র্পযন্ত ছাত্ররা ভোটার হওয়ার সুবাদে আমরা স্কুল সংসদে ভোট দিলাম। এই সময় স্কুলে দুই শিফট চালু হয় আর অনেক নতুন ছাত্র যোগ দেয়। যাদের মধ্য ফুজায়েল- জুনায়েদ, যীশু, মনসুর, ইকরার, জিয়া, লিটু, জেসমিন, সাঈদা, বেবী (সেরনিয়াবাত) অন্যতম। বেবী ১৯৭৫

সালের ১৫ আগষ্টে শহীদ হয়।। নতুন শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন, মনসুর স্যার, অনুপ স্যার, মোল্লা স্যার আর হাকিম স্যার। মোল্লা স্যারের বেতের ভয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও আমি ইসলামিয়াত এর বদলে অর্থনীতি নিলাম।

এই নতুন ছাত্রদের মধ্যে ফুজায়েল জুনায়েদ ছিল জমজ ভাই। ফুজায়েল' এর নাম আমরা কেউই ঠিকমত বলতে পারতাম না। ফুজায়েল খুব ক্লাস কামাই করতো এবং বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতো আর আমিও তার সানিধ্যে এসে ক্লাসে যাওয়া এক রকম বন্ধই করে দিলাম ক্লাস সেভেন থেকে! এইভাবে ক্লাস কামাই' এর মধ্য দিয়ে, ' ক্লাসফ্রেন্ড' এই ফুজায়েল, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড' এ পরিনত হয়। আমাদের মেয়ে বন্ধুরাঃ মেয়ে সহপাঠিদের মধ্যে রুমানা, জেসমীন খুবই ভালো আর কাইন্ড হিসাবে পরিচিত ছিলে। আমরা পিকনিকে রুমানাদের গ্রামের বাড়ি টাইপ একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। দুই শিফট চালু হওয়ার পর আস্তে আস্তে আমদের সাথে ক্লাসের মেয়েদের কেমন জানি একটা দুরত্ব হয়ে যায়। শুধুমাত্র পিকনিক এর দিন সবাই খুউব ফ্রেন্ডলী হত! ঢাকা ইউনিভার্সিটির এবং ঢাকা শহরের অনেক বড় বড় পান্ডা আমদের ক্লাসের কয়েকটা মেয়েকে খুউব পছন্দ করতো এবং তাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদেরকেও খুব খাতির করতো! মহসীন হলে সাত খুনের ঘটনার সাথে জড়িত একজন সন্ত্রাসী আমাকে আর মিজান' কে খুবই খাতির করতো! ক্লাস এইট নাইনে থাকা অবস্থায় আমারা সেই সন্ত্রাসীর সুবাদে আর্টস ফ্যাকাল্টি' তে আর টি, এস, সি তে তাদের সাথে আড্ডা দিতাম! মজার ঘটনাঃ অংক পরীক্ষার সময় প্রশ্ন ছিলো, ১২ টি আমের দাম ১৮ টাকা হইলে, ৫ টি আমের দাম কত? আমদের ক্লাসের রেজা পরে স্যারের কাছে কমপ্লেইন করল, স্যার আপনে ক্লাসে আনারস দিয়ে শিখিয়েছেন, আম দিয়ে শিখান নাই! আর মিজান, ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রাক্টিকালের সময় এক্সটারনাল প্রশ্ন করলো, ' একটি উভচর প্রানীর নাম বলো, মিজান বললো ব্যাং, এক্সটারনাল আরেকটি উদাহরন চাইলে, মিজান উত্তর দিল, ' আরেকটি ব্যাং' ! শুনে রাগে দুঃখে বায়োলজী' র প্রিয় সাদেকুন নাহার আপা মিজান' কে বলেছিল, "মিজান, তোমার উন্নতি হচ্ছে মূলার

মত"। যখনই এই কথা মনে হয়, তখন আমরা সব বন্ধুরা হাসতে হাসতে মরে যাই। এখনও মনে হয়, যদি আর একবার ফিরে যাওয়া যেত সেই দুরের সকালে!

নাজমুল আহসান শেখ ১৯৭৭ ব্যাচ, victory1971@gmail.com

নওদা বুরজ এবং জৈন ও বৌদ্ধ

ওমর খালিদ রুমী

বাংলা, বিহার ও নেপালের কিছু অংশ জৈনগুর মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আমলের পরপরই জৈন ও বৌদ্ধদের আবাসস্থন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুর করে। বাংলার পুরো অঞ্চলটাই জৈন ও বৌদ্ধদের একেবারে নিজস্ব জায়গা বা স্থান হিসাবে পরিণত হয় এই দুই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পরপরই।

মৌরীয় সম্প্রদায়ের মহারাজা চন্দগুত্ত (সংস্কৃতকরণ করে চন্দগুত্ত পুডনগল, তমলিপি, বরেন্দ ইত্যাদি শব্দ/নামগুলোকে কিছু লেখক ১৮/১৯ শতকে সংস্কৃতকরণ করে চন্দগুত্ত পুন্ড্রুনগর, তাম্রলিপি, বরেন্দ্র ইত্যাদিতে   পরিবর্তিত করে) ও পরে দ্বিতীয় চন্দগুেত্তর (খৃঃ তৃতীয়/ চতুর্থ শতক) মাধ্যমে এবং তারও পরে কিছু সামন্ড় রাজাদের মাধ্যমে জৈনরা একেবারে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশে পুরোপুরি প্রভাব বজায় রাখে। অশোক জৈন থেকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে বৌদ্ধদের প্রভাবও এদেশে বাড়তে থাকে। পালদের আমলে এসে সেটা বেড়ে যায় ভীষণভাবে। সহযান, কালচক্রযান, বজ্রযান-এর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ক্ষমতা প্রবাহিত হয় বিশেষভাবে। এর আওতায় সাধারণ জনগণ থেকে রাজা মহারাজা ও সামন্তপ্রভুরাও পড়ে যান। তবে জৈনরা সংখ্যায় অনেক ছিল। হিউয়েন সাং ৬৪৫ খৃঃ বাংলাদেশে এসে দিগম্বর জৈন ও বৌদ্ধদের পাশাপাশি দেখতে পান। এই দুই ধর্মীয় উন্মাদনা একেবারে বখতিয়ার খলজির (১২০৪-৫ খৃ) আগমণের আগ পর্যন্ড় বজায় ছিল। বখতিয়ারের হাতে নালন্দা ধ্বংস হলে বৌদ্ধরা ও সেই সঙ্গে জৈনরা পালিয়ে যেতে থাকেন পাহাড় ও জঙ্গলে। শেষ পর্যন্ড় বখতিয়ার বাংলায় লক্ষণ সেনের দোড়গোড়ায় এসে হাজির হলে এই অঞ্চল ও

ওমর খালিদ রুমী

আশে পাশের অঞ্চল থেকে জৈন ও বৌদ্ধরা পালিয়ে যান চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড় ও জঙ্গলে। র‌্যাল্‌ফ্ ফিচ ১৫৮৫ সালে দিগম্বর জৈনদের দেখতে পান ত্রিপুরার পাহাড়ে। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত জৈন এবং বৌদ্ধরা নিজেদের অবস্থানে ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাংলাদেশ ও নিকটাবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলোতে বিশেষ করে লক্ষণ সেনের বংশধররা বিক্রমপুর ও নিকটবর্তী এলাকাগুলোতে রাজত্ব চালিয়ে যান ১৩ শতকের শেষ পর্যন্ড়। বৌদ্ধ রাজা পরশুরাম ও মহাস্থান ও কাছাকাছি অঞ্চগুলো তার শাসনের আওতায় রাখেণ বলখী মহীশওয়ারের আগমণ পর্যন্ত। এটি হচ্ছে ১৫ শতকের ঘটনা (ময়মনসিংহের ইতিহাস) তবে ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার নওদা হাজির হলে লক্ষণ সেন পালিয়ে যান বিক্রমপুরে। সঙ্গে সঙ্গে অনুসারী বৌদ্ধ এবং জৈনরাও রহনপুর ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। রহনপুর ওই সময় বৌদ্ধ কেন্দ্রিক জনপদ ছিল। বর্তমানের রহনপুর বুরজে বৌদ্ধ মূর্তি প্রাপ্তিতে সেটা আরো নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। এটি পাওয়া গেছে বুরজের ঢিবিতে।

স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত হয় যে, এই বৌদ্ধবিহারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লক্ষণ সেন স্বয়ং। লক্ষন সেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিলেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া পৃষ্ঠপোষক ছাড়া কোনো বৌদ্ধ বিহারই টিকে থাকতে পারেনি যা আমরা ইতিহাসে পাই। পালদের আগমনের পরেই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে ও শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয় ১৩ শতক থেকে ১৫ শতকের মধ্যে। তাছাড়া রহনপুরের কাছাকাছি রাজশাহীর বিহারৈল, নবাবগঞ্জ, খালিমপুর ও জাগদলেও বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই বিহার গুলো পরিচালনার খরচ শুধু রাজামহারাজাদের পক্ষেই বহন করা সম্ভব । লক্ষণ সেন এই অঞ্চলের (১২০৫ পর্যন্ড়) শাসক ছিলেন বলেই তারই ছত্রছায়ায় বৌদ্ধবিহার গুলোর অস্থিত্ব বজায় ছিল। বখতিয়ারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলোর অস্তিত্বে ছেদ পড়ে যায় ও বৌদ্ধ বিহারগুলো একে একে সব পরিত্যক্ত হয়। রহনপুরের বিশাল বৌদ্ধ বিহারটিও খালি হয়ে যায়। আজ এতো দিন পড়েও সেটি পহাড়পুড়ের বিহারের মতো আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজশাহীর বিহারৈল গুপ্তযুগের বৌদ্ধ মূর্তি, খালিমপুরে গুপ্তদের ও পালদের (?) তাম্রশাসন, জাগদলে গুপ্তযুগের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্তির পর এটাই বোঝা যাচ্ছে যে অশোকের সময় (খৃ.পূ. তৃতীয় শতাব্দী) বা তার আগে থেকেই এই অঞ্চলে জৈন বা বৌদ্ধদের আবাসস্থল ছিল। পুডনগল (পুন্ড্রুনগর), বাসুবিহার/বিহার তখন এই দুই ধর্মের মানুষদের পদসঞ্চালনে মুখর। আমরা আগেই জানি গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বাসুবিহাওে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের সঞ্চিত পদচিহ্ন বাসুবিহারে ছিল যা চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং নিজের চোখেই দেখেছিলেন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে যা চুরি হয়ে যায় বৃটিশ আমলে । গৌতম বুদ্ধের

এই অঞ্চলে আগমনের প্রায় পরপরই বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রভাব।

ঈদদুল ফিতর - ২০১৫

হ্যাপি রহমান

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

প্রতি বছরের মত ঘুরে ফিরে এবারও মুসলিম উম্মার জন্য আনন্দ ও খুশির বার্তা নিয়ে এল পবিত্র ঈদ উল **ফিতর**।চাঁদ দেখার ভিত্তিতে যথাযোগ্য মর্যাদা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর ।অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিসহ অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা উৎসবমুখর পরিবেশে ঈদ উদযাপন করে।মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বেশ কিছু জায়গায় গত ১৬ তারিখ শুক্রবার ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।১৭ তারিখ শনিবারও ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, ভারত এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মুসলমানদের

সবাইকে দেখা গেছে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে।স্থানীয় সময় ১৬ ও ১৭ জুলাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, ব্রিসবেন, এডিলেইট, ক্যানবেরা, মেলবোর্ন ও পার্থসহ বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত মুসলমানগন স্বপরিবারে নিকটস্থ মসজিদ ও খোলা মাঠে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদকে ঘিরে সরকারি-বেসরকারিভাবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ছুটি থাকেনা অস্ট্রেলিয়ায়।অমুসলিম প্রধান এই দেশে ঈদের জন্য আলাদা ছুটি না থাকলেও অধিকাংশ মুসলমানেরা প্রতি বছর দুই ঈদে ছুটি নেন। কেউ কেউ কর্মব্যস্ততার জন্য ছুটি নিতে পারেন না। তাঁদেরকে আবার ঈদের নামাজ আদায় করেই ছুটে যেতে হয় কর্মস্থলে। অবশ্য এ বছর শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঈদ হওয়ায় কর্মদিবসের চেয়ে অনেক বেশি মুসলমানের সমাগম হয়েছে ঈদের জামাতগুলোতে।সিডনিতে বেশ কয়েক জায়গায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। লাকেম্বার বড় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত।এছাড়াও সিডনি অলিম্পিক

পার্ক, প্যারামাটা মসজিদ, লিভারপুল, ব্ল্যাক টাউন সাবাবের কুইকার হিলস জামে মসজিদের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ঈদের জামাত। পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নামাজ শেষে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আগত মুসল্লিগণ।প্রবাসে ঈদের অনুভূতি জানতে চাইলে প্রবাসী বাংলাদেশী আসাদ, মতি, মাজু, সঞ্জু, কবির, তুষার,

শামিম, সালাউদ্দিন, মুনমুন, তামান্না পৃথকভাবে জানালেন যদিও এখানে পরিবার নিয়ে থাকি কিন্তু দেশের ঈদের আবেগটা অন্যরকম। দেশে প্রিয়জনদের খুব বেশি মিস করি।আত্মীয়স্বজন ছাড়া ঈদ করলেও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য বিনিময়ও এই আনন্দোৎসব প্রবাসীদের

জীবনযাত্রায় এক পশলা বৃষ্টির মতোই সুখকর। পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেশটির প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবাট একটি ভিডিও বার্তায় অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত সকল মুসলিমজাতিকে শুভেচ্ছা জানান।

"অস্ট্রেলিয়াতে বাসভূমির যুগপূর্তি উৎসব"

হ্যাপি রহমান

গত ৭ই জুন বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক যুগ-পূর্তি উদযাপন করলো বাসভূমি।মূলত বিদেশের মাটিতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে বাংলা সংস্কৃতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে বাসভূমির যাত্রা। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ' বাসভূমি' র এক যুগ পূর্ণ হলো।গত ১২ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি খণ্ড নাটক, টেলিফিল্ম, ধারাবাহিক নাটক ও ট্রাভেল শোসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান নির্মাণ করছে নিয়মিত। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি আর দর্শনীয় জায়গাগুলোর বর্ণনাসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জীবন আলেখ্য এবং বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে উঠে এসে কিভাবে এই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বসতি স্থাপন করা যায় তার অনুসন্ধানী, ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে সাম্প্রতিককালে নির্মাণ করেছেন ট্রাভেল ডকুমেন্ট।ট্রাভেল ডকুমেন্টের রচয়িতা ও পরিচালক আকিদুল ইসলাম বলেন, নামকরন ট্রাভেল ডকুমেন্ট হলেও এটি মূলত একটি ইতিহাসের আলোকিত অনুষঙ্গ।বাসভূমি মূলত একটি অনলাইন পত্রিকা হলেও দেশীয় সংস্কৃতি,শিল্প,সাহিত্য এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করে প্রশংসিত হয়েছে। সিডনির হার্সভিল এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারে সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হয় এই যুগ পূর্তি উৎসব। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে দর্শক দাঁড়িয়ে কণ্ঠ মেলান।বাসভূমির কর্ণধার আকিদুল ইসলামের পরিকল্পনায় সামান্তা ইসলামের সাবলীল সুন্দর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়ে উঠে। শুরুতেই ছিল অভিজিত বড়ুয়া ও পিয়াসা বড়ুয়ার দ্বৈত গানের পরিবেশনা।তারপর নূপুরের তালে তালে মঞ্চ মাতাতে আসেন নৃত্যশিল্পী অর্পিতা সোম।নৃত্য শেষে আকিদুল ইসলাম বাংলা কমিউনিটির শীর্ষ স্থানীয় বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে মঞ্চে আসার আহবান জানান।তারা প্রত্যেকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় বাসভূমির প্রশংসা করেন এবং উষ্ণ অভিনন্দন জানান।আলোকিত মানুষের কাজে উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগানোর প্রয়াসে গত বছর থেকে বাসভূমি চালু করে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান।এবছর বাংলাদেশি কমিউনিটির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ব্যরিস্টার সিরাজুল হককে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়।বাসভূমির পক্ষে বাংলাদেশি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাহিন আবেদিন সম্মান সূচক এ ক্রেস্টটি সিরাজুল হকের হাতে তুলে দেন। সামাজিক পারিবারিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান তুলে ধরেন আকিদুল ইসলাম। এসময় তিনি অনুষ্ঠানে আগত সকল নারী ও মায়েদের অনুপ্রাণিত করে সম্মান জানানোর জন্য মঞ্চে আসার আহবান জানান।মধ্য বিরতির পর প্রদর্শিত হয় বাসভূমি নির্মিত টেলিফিল্ম ' সিডনি টু মুরাদনগর' এর প্রিমিয়ার শো।বাংলাদেশের মূলধারার অভিনেতা অভিনেত্রীসহ অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী অভিনেতারা ও টেলিফিল্মটি' তে অভিনয় করেন।কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি রহমতউল্লাহ ও ফজলুল হক শফিক।এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় টেলিভিশন তারকা রওনক হাসান, আলভী, নিশা ও প্রান রায়।

বেঁচে থাকুক কঠিন বাংলা শব্দ

খন্দকার জাহিদ হাসান

কথিত আছে, একদিন এক ইংরেজ সাহেব নাকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে বাংলা ভাষাজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। সাহেব ভালই বাংলা শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল নিতান্তই পুঁথিগত। সেই মুহূর্তে তাঁরা দু'জন এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিলেন । নদীতে এক মাঝি নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজ সাহেব বিদ্যাসাগরকে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, ''এসো, আমরা দু'জন একে একে এই মাঝিকে তার নৌকা কূলে ভেড়াতে বলি। আমাদের মধ্যে যার ডাকে মাঝি সাড়া দেবে, সে-ই জিতবে।'' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক কথাতেই রাজী। প্রথমে সাহেবের পালা। সাহেব হাঁক ছাড়লেন, ''ওহে তরণীধর! তব তরী তটে সংলগ্ন কর।'' সাহেব বার বার একই ভাষাতে মাঝিকে ডেকে চললেন। বলা বাহুল্য, সাহেবের ডাকে মাঝি সাড়া দিল না। বরং তাঁকে পাগল ঠাউরে মাঝি তার গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। এবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডাকলেন, ''মাঝিভাই, তোমার নাওটি ডাঙ্গাতে একটু ভেড়াও তো!'' সঙ্গে সঙ্গে কাজ হল। এ গল্প হয়তো অনেকেরই জানা আছে।

এ তো গেল পুঁথিগত ভাষা আর কথিত ভাষার দ্বন্দ্বের গল্প। এবারে শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে আসা যাক। বর্তমানে চতুর্দিকে রবঃ কথায় সংযত হও, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কর, সহজ শব্দে সরল বাক্য গঠন কর। না হলে মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে না। ক্রিয়াপদের সাধু রূপের তো প্রশ্নই ওঠে না। চলিত বল। চলিত লেখ। চলিতে সাহিত্য চর্চা কর।

নাহ্, এক সময় চলিতও কঠিন ঠেকতে শুরু করল। দিনকাল পাল্টে যাছে। মনের ভাব আয়াসে প্রকাশ করতে হবে। কোনো প্রহেলিকা রাখা যাবে না। লক্ষ্য রাখতে হবেঃ পাঠক যেন হোঁচট না খায়, শ্রোতা যেন বিড়ম্বিত না হয়। কঠিন শব্দ পরিহার করতে হবে। যা কিছু বাহুল্য, তা নাকি পরিত্যাগ করতে হবে। তাই এক সময় 'পহেলা বৈশাখ' হয়ে গেল 'এক বৈশাখ'। 'সাতই মার্চ' হয়ে গেল 'সাত মার্চ'।... এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? জানি না 'বাহুল্য'-এর সংজ্ঞাটা কি?

আমরা যেভাবে কথা বলি, এখন থেকে সেভাবেই নাকি নাটকের সংলাপ লিখতে হবে। সাহিত্যের নাকি আর আলাদা কোনো ঢং থাকার দরকার নেই! তবে কি জলের মতন তরল করে সাহিত্যের সব সামগ্রী মানুষের সামনে পরিবেশন করতে হবে? স্থুল ধরণের দেহাতি কায়দায় সমাজের প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ে শিল্প-সাহিত্যের সোমরস পৌঁছে দিতে হবে!?

তাই বোধ হয় হালের বাংলা নাটকের সংলাপের একটি নমুনা এ-রকম (নীচের উদাহরণটি কাল্পনিক, তবে আজকাল বাস্তবে যা ঘটছে, এখানে তার সাথে মিল রাখা হয়েছে)ঃ-
''দেখছো, কি সুন্দর পরজাপতি চারিদিকে উড়ে বেড়ায়তেছে!''
''ঠিক বল্ছো। আমি তো বুঝে উঠবার পারতেছি না এরা বর্তমানে কুঞ্জবন ছেড়ে লোকালয়ে ভীড় জমাচ্ছে কুন্ দুঃখে!''

বাহ্! কথ্য, আঞ্চলিক, চলিত আর শুদ্ধ রীতির কি মনোহর এক জগাখিচুড়ি! আর আজকালকার গল্পের 'কেন্দ্রীয় চরিত্র'? না, কিছু কিছু গল্পে এ-রকম কোনো ব্যাপারই আর নেই। আদর্শবাদী নায়ক কিংবা সংগ্রামী নায়িকার আর কোনো বালাই নেই। আর কোনো দরকারও নেই ওদের। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত'-এর সেই রাজলক্ষ্মী তখনকার কুটিল সমাজের নাগপাশ থেকে রেহাই পাওয়ার

জন্য জীবিকা হিসেবে যে পেশাই বেছে নিতে বাধ্য হোক না কেন— তার তো ছিল এক পরিচ্ছন্ন সংস্কার, কমনীয় মুখাবয়ব, দৃঢ় অঙ্গীকার, অটল আদর্শ, কোমল মাতৃহৃদয় আর প্রেমপিয়াসী এক আকুল চিত্ত। ঐ উপন্যাসের সব পাঠক-পাঠিকা বা ঐ ছায়াছবির সকল দর্শকের মন রাজলক্ষ্মীর জন্য অপার সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। তার প্রতি শ্রদ্ধায় সকলের মাথা নত হয়ে আসে।

আর এখনকার অনেক গল্পের আধুনিক সব রাজলক্ষ্মীর নেই কোনো সুবচন, নেই কোনো কমনীয়তা, প্রেমের ক্ষেত্রে নেই কোনো স্থিরমতি। বিবেক, বিচারবুদ্ধি আর আদর্শের কোনো ধারও তারা ধারে না। প্রায়ই এমন সব সুবিধাবাদী নায়িকা-চরিত্র দেখানো হয়, যাদের জন্য মনের মাঝে বিন্দুমাত্র করুণারও উদ্রেক হয় না। গল্পকারের যুক্তিঃ বাস্তবে নাকি আজকাল সমাজে এ-সকলই ঘটছে। ভাল কথা। কিন্তু এরা ভুলে যায় যে, শিল্পের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানো নয়— সেই সাথে সমাজ সংস্কার, মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও চিরন্তন প্রেমের জয়গান করাও শিল্পের উদ্দেশ্য। এই সব গল্পের ওপর ভিত্তি করে এ-যুগের সত্যজিত রায় (!) কাহিনীকাররা চলচ্চিত্রও বানিয়ে ফেলছে। অর্থহীন শিরোনামধারী এই সব তৃতীয় শ্রেণীর চলচ্চিত্র এক শ্রেণীর দর্শক খাচ্ছেও দেদার। সেগুলো আবার অস্কার চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় পাঠানোও হচ্ছে।

তবে কি একদিন সব কবিতাও কথ্য রীতিতেই লিখিত হবে!? কবিতারও কি কোনো পৃথক স্বকীয়তা একদিন আর থাকবে না?

'অকস্মাৎ অন্যপূর্বা প্রেয়সীর প্রতি মন্মথ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। প্রেমিকার শিঞ্জন তার অসহ্য হয়ে উঠল। বৃংহিত কানে গেলে যেমন সামান্য থমকায় দুর্ধর্ষ আরণ্যক, মন্মথও তেমনি বারেক থমকাল।। পথিপার্শ্বের বৃক্ষশাখা হতে দ্বিজদম্পতি যুগলকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল।'

''না-না, সাহিত্যের নামে এ-সব কালোয়াতি আর চলবে না। এত সব অসংখ্য কঠিন কঠিন শব্দের মানে কি আর এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণ করে রাখা সম্ভব! আর তার দরকারই বা কি! হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-ঈ-এর মামদোবাজিও আর চলবে না! ঋ-কারের ঋণ জন্মের মতো পরিশোধ করে ফেলতে হবে। ণ-ত্ব বিধান আর ষ-ত্ব বিধানের কোনো বিধান আর আমরা মানতে রাজী নই। নিপাতনে সিদ্ধকে এখন-ই জ্যান্ত সিদ্ধ করে মারতে হবে আমাদের।''— চারিদিকে আজ এই মনোবৃত্তি আস্তে আস্তে জেঁকে বসছে।

আজকাল কোনো গল্প, কবিতা কিংবা নিবন্ধ পড়তে শুরু করলে ভুল বানান আর অশুদ্ধ বাক্যের কারণে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়— লেখার মান বিচারের প্রশ্ন তো পরের কথা। দিন দিন এই অবস্থার অবনতি ঘটেই চলেছে। বিজ্ঞজন মাত্রই এর কারণ সম্বন্ধে অবগত আছেন। সেটা উল্লেখ করে জ্বালা আর বাড়ানোর দরকার নেই।

এই অস্ট্রেলিয়াতেও নাকি এখন মাত্র হাজার খানেক ইংরেজী শব্দ জানা থাকলেই ভাবের দৈনন্দিন আদান-প্রদানের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়! সামান্য কঠিন শব্দের মানেও এখনকার প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে আর বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না। সেদিন এক প্রবীন শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলীয় ভদ্রলোক আক্ষেপ করছিলেনঃ 'Are you from this vicinity? —এভাবে জিজ্ঞেস করলে বর্তমান যুগের অনেক নবীনই এখন হা করে চেয়ে থাকে। অথচ আমাদের কালে আমরা অহরহ এভাবেই অচেনা মানুষকে জিজ্ঞেস করতাম। এখন বলতেই হয়ঃ Are you from this area?'

মনের উষ্মাটা একটু বেশীমাত্রাতেই প্রকাশ করা হয়ে গেল। এই প্রগল্ভতার জন্য সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বেঁচে থাকুক কবিতা। চিরকাল বেঁচে থাকুক সব কঠিন শব্দ। কারণ এগুলি আমাদের সম্পদ।

উষার আলো

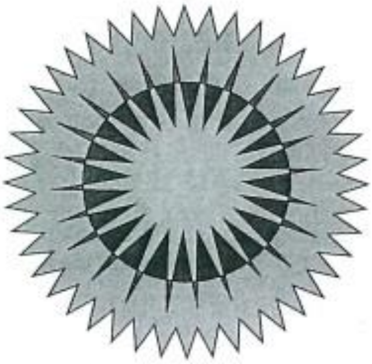

মোঃ রকিব উদ দৌলা

লায়লা ফিরে চললো ক্লান্ত পদক্ষেপে। শাকিল দেখলো একজন স্বামী-সন্তান হারা অসহায়া নারী তার ভুলের মাশুল দিতে অন্ধকারে ফিরে চলেছে। বারান্দায় পাঁচ ওয়াটের ছোট্ট নীল বাল্বটা এই গভীর রাতে একদা স্বামী-স্ত্রীর বিয়োগ ব্যাথার সাক্ষী হ'য়ে নীরবে মিট মিট করে একটানা আলো দিয়ে যাচ্ছিল। আর সেই ক্ষীণ আলোর রেখায় যতদূর দেখা যায় শাকিল চেয়ে রইলো বিদায়মান লায়লার দিকে। অবশেষে গেটের তরুলতা ঘন তিমিরে এক সময় লায়লার ক্লান্ত দেহটা হারিয়ে গেল।

উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্তের পর যেমন হয় শাকিলেরও তেমন হ'লো। দরজাটা ভাল করে বন্ধ করতেও যেন সে পারল না আজ। শাকিল তখনও কাঁপছে। কোন রকমে সে ঘরে গিয়ে চেয়ারে ব'সে পড়লো। যে বইটা সে কতক্ষণ আগে পড়ছিল দু'একবার নাড়াচাড়া করলো। "নাঃ - বইতে মন কিছুতেই বসবে না"। অতঃপর - শাকিল একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেটের ধোঁয়া গুলো যেন আজ বড় বেশী ঘন মনে হ'লো। শাকিলের মনের আকাশে তার চেয়েও ঘন মেঘ জমে উঠেছে। পর পর কয়েকটা সিগারেট শেষ করে শাকিল নিজেকে যেন একটুখানি হালকা মনে করল। বইটা আর কয়েকবার নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যেন আর এক বার ভাবনার ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লো তা বুঝতে পারল না সে।

শাকিল ভেবেই চলেছে তখন।" এ কি সে ভাল করেছে? " - তারই এক সময়ের এত আদরের ধন লায়লা; যাকে সে মাত্র তিনটি বছর আগেও এত প্রেম, এত ভালবাসা দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল; যাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল তার জীবনের প্রথম জয়যাত্রা। এই লায়লাই তার জীবনের প্রথম নারী, প্রথম প্রেমিকা, প্রথম স্ত্রী এবং তার প্রথম সন্তানের জননী। শকিলের 'মিতু'রই মা এই লায়লা।

অনেক কথা মনে আসছে শাকিলের। লায়লার মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই আজ। শাকিল বিদেশে থাকা কালীন মাত্র এক বৎসরের ব্যবধানেই সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন তারা। বাবা মার একমাত্র সন্তান লায়লা। লায়লার ছোট্ট বুকখানি পর পর এত বড় দু'টি আঘাত কেমন করে সয়েছিল তা জানতে শাকিলের মনে এক ক্ষনিক আগ্রহ দেখা দিয়েই বিলিন হয়ে গেল। বাবা-মার একমাত্র আদরের মেয়ে ছিল লায়লা - সুন্দরী, শিক্ষিতা। বহু খোঁজ করে লায়লার বাবা শিক্ষিত, সৎ ও উদার চরিত্রের অধিকারী শাকিলের মত পাত্রের হাতে লায়লাকে সমর্পন করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। আজ সে লায়লা পিতৃমাতৃহীনা, স্বামীহীনা, নিরাশ্রয়। ভিখারিনী। শাকিলের মনে কিসের যেন একটা অদ্ভুৎ ব্যথা অনুভূত হ'লো। শাকিল ভেবেই চলেছে - "একি সে ভাল করলো?" - লায়লার কথাগুলো শাকিলের মনে বার বার আঘাত হানতে লাগলো। "আমি ক্ষমা চেয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছি" বাবা-মার আদুরে সন্তান, শাকিলের এক সময়ের কত সাধের সহধর্মিনী - পরম প্রিয়তমা লায়লা - সে কিনা আজ নিরাশ্রয়! শাকিলের মন ক্ষনিকেই যেন আবার শক্ত হয়ে গেল। "নিরাশ্রয়া?" - "হোক সে নিরাশ্রয়া" - "লায়লার মত যারা - তাদের কেউ যেন আশ্রয় না দেয়, এরা যেন দোজখেও আশ্রয় না পায়।" শাকিলের মন যেন লোহার মত শক্ত। তবুও শাকিলের যেন ভাবনার শেষ নেই। একটা কথা ভাবতে না ভাবতেই অন্য আর একটা কথা ভীড় করে আসে। লায়লার সাথে তার বিবাহ - তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম - শাকিলের উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত গমন - লায়লার মার মৃত্যু - লায়লার বাবার মৃত্যু - লায়লার চাচির লায়লাদের বাড়ি দখল - অবশেষে লায়লার দ্বিতীয় বিবাহ, ওরই চাচাতো ভাইয়ের সাথে এবং তার পর পরই শাকিলের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ ও দেশে প্রত্যাবর্তন। লায়লার কথাগুলো যেন আবার কানে ভেষে আসতে থাকে। "এই কি তোমার শেষ কথা? " "আমার ভুলের কি কোনো সংশোধন নেই? বাঁচবার মত একটা অবলম্বনও কি আমাকে দেবে না? তবে আমি কি করবো - তুমি বলে দাও।" আস্তে আস্তে শাকিলের মনে কেমন যেন এক অদ্ভুৎ শিহরণ খেলে গেল। লায়লা ভুল করেছিল। চরম ভুল। জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক যে ভুল - তাই করে বসেছিল লায়লা। কিন্তু আজ সে অনুতপ্ত তার ভুল আজ সে বুঝতে পেরেছে - রিক্তা হয়ে আজ সে ক্ষমা প্রার্থিনী। কিন্তু কি আশ্চর্য। শাকিল তো তাকে ক্ষমা করতে পারলো না। লায়লাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল; লায়লাকে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে ব'লেছিল অসম্মান ও অপমান করে, উত্তেজনায় হাবুডুবু খেতে খেতে। বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র সমাজে একদা যে অত্যন্ত উদার পন্থী ব'লে প্রশংসার মালা গলায় পড়ার গৌরব অর্জন করেছিল; একদা যে শাকিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এক করিডোর থেকে অপর করিডোর পর্যন্ত, এক ক্লাসরুম থেকে অপর ক্লাসরুম পর্যন্ত - এমনকি অধ্যাপক মহলেও উদার নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এত ঘটা করে বুক ফুলিয়ে গর্বের সাথে ঘোষনা করেছিল,

"পাপীরে যে ভালবাসে
আমি ভালবাসি তারে -
সেজন দেবতা আমার"

কই? সে শাকিল আজ কোথায়? দীপ্ত নয়ন সহাস্যবদন, রক্তিমাভ আননের অধিকারী শাকিল আহমেদ - যে একটা একদা বিশ্ববিদ্যলয়ের উদারপন্থীদের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছিল - সে শাকিল আহমেদ আজ কোথায়? শাকিল যেন কেমন হয়ে গেল এক মুহুর্তে। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলো। এত সংকীর্ন মন তার? জীবনে যখন পরম ক্ষমার মুহুর্ত উপস্থিত হয়েছিল, তখন কেন পারলো না সে উদার হ'তে? উদার মনের পরিচয় তবে কখন দিবে সে? সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেল শাকিলের। ভুল করেছিল লায়লা, ভুল কি মানুষ করে না? কিন্তু এ ভুল তো যেমন তেমন ভুল নয়। এ ভুলের কি ক্ষমা নেই? লায়লা আজ চরম ভুলের জন্য ভিখারিনী হ'য়ে কাঁদছে। সে কি কখনও তার জীবনের এমন পরিনতির কথা ভাবতে পেরেছিল? এর জন্য কে দায়ী? শুধুই কি লায়লা? শুধুই কি সমাজ ব্যবস্থা? সে কি কিছুমাত্র দায়ী নয়? হোচট খেয়ে লোকে যেমন আছাড় খায়, শাকিল যেন কতকটা সেইরূপ অনুভব করলো। "হ্যা, সেও দায়ী বৈকি।" শাকিল বিদেশে যাওয়ার কয়দিন আগেও লায়লা ভাল করে খেতে ঘুমাতে পারতো না। শুধু বলতো, "তোমাকে ছাড়া এতদিন কেমন করে কাটিবে? " শাকিল যদি লায়লাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো - তবে? তবে কি লায়লার জীবনে নামতে পারত এ কলঙ্কময় অধ্যায়? শাকিল আর ভাবতে পারছে না যেন। মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা থেকে থেকে টন্ টন্ ক'রে উঠছে। কিন্তু তবুও শাকিলকে ভাবতে হবে; হ্যাঁ, তার ও

আজ যেন রেহাই নেই। কি হ'তো যদি শাকিল বিদেশ না যেত? বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ

ডিগ্রীধারী পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট - শাকিল আহমেদের বিদেশ যাওয়ায় কি প্রয়োজন ছিল? বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডক্টরেট ডিগ্রী না হ'লে কি শাকিল আহমেদের জীবনটা সত্যি মাটি হ'য়ে যেত? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শাকিল আহমেদ জানতে পেরেছিল বিদেশী ডক্টরেট না হ'লে সে কোনদিন "প্রফেসর" এর সম্মান পাবে না। তবে? শুধু কি সেই দায়ী? শাকিলের মনটা সমাজের নেতৃস্থানীয়দের উপর কেমন যেন এক অজানা অচেনা আক্রোশে ফুলতে লাগল। একি ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন তাঁরা?

শাকিল কখন যে ঘর থেকে বের হ'য়ে অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছে - একটু খেয়ালও তার নেই। বুঝতেও পারে নাই অন্ধকার পথে কখন কেমন ক'রে সে লায়লার বাবার বিরাট বাড়িটার সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যন্ত্র চালিতের মত অনেকটা অভ্যস্ত হাতে বাড়ির গেটটা খুলে ফেলল। বেশীদূর যেতে হ'লো না শাকিলকে। সামনেই খোলা দরজার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোকে শাকিল দেখতে পেল লায়লার দেহটা বিছানায় উপুড় হয়ে যেন ফুলে ফুলে উঠছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল শাকিল - লায়লা বিছানায় উপুড় হ'য়ে কাঁদছে। পাশেই শাকিলের বিলেত থেকে পাঠেনো একখানা ফটো। রোরুদ্যমান, অসহায়া, পিতৃ-মাতৃহীনা লায়লার প্রতি শাকিলের মন ক্রমেই করুনাশিক্ত হয়ে উঠছে। আচম্বিতে শাকিল অনুভব করলো যে ওর দুখগণ্ড বেয়ে অশ্রু ধারা বেয়ে নামছে। শাকিল নিঃশব্দে কাঁদছে। ক্রন্দনাবেগ দমন করতে গিয়ে শাকিলের মুখ দিয়ে কেমন যেন দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত একটা শব্দ বের হয়ে গেল। শব্দ শুনে লায়লা যেন ভীতা হরিনীর মত চমকে উঠে "কে? " "কে?" বলেই স্তম্ভিত মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই দেখতে পেল শাকিলকে - অবিশ্বাস্যরূপে যেন ভূতের মত দাঁড়িয়ে। নেজের চোখকে যেন লায়লা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ কি সম্ভব?

"বিশ্বাস হচ্ছে না; লায়লা, না?" অত্যন্ত ধীরে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা নিংড়ে যেন কথা কটি বেরিয়ে এল শাকিলের অন্তরের কোথা হ'তে। "ভুল আমিও করেছি, লায়লা; জানি না তোমার আমার এ ভুলের জন্য কে বা কারা দায়ী। কিন্তু যেই দায়ী হোক - আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। ক্ষমা করলাম। এসো, আজ আমরা শপথ গ্রহন করি - এমন সমাজ ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলব যে সমাজে লায়লারা করবে না ভুল, শাকিলরা ও করবে না ভুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশী ডক্টরেট এর জন্য ছুটতে হবে না তাদের সন্তান-সন্ততিদের পেছনে ফেলে - সন্তানের মা-বাবাকে পেছনে ফেলে।"

লায়লা শাকিলের প্রশস্ত উদার বুকে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উঠছিল - আনন্দের আতিশয্যে ক্রন্দনাবেগ যেন কিছুতেই বাধা মানছিল না। অস্ফুট স্বরে ব'লে যাচ্ছিল - "শাকিল তুমি সত্যই মহৎ, সত্যই উদার, আমায় ক্ষমা কর শাকিল, ক্ষমা কর।" শাকিলের নিঃশব্দ ক্রন্দন ও যেন ভাষা ও শব্দ খুঁজে নিল। মমতা ভরা দু'হাতে লায়লাকে জড়িয়ে ধরে সে যেন পৃথিবীকে ভুলে গেল। রাত্রির ঘন তিমির কেটে গিয়ে কখন যে উষার আলো দেখা দিয়েছে তা কেউ টের পায়নি।

সাহিত্য পাঠ:

তোফাজ্জাল সরকার

এবারের সাহিত্য পাঠ বিখ্যাত রম্য লেখক সৈয়দ মুজতবা আলির লেখা নিয়ে। সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেটের করিমগঞ্জে ১৯০৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে এবং জার্মানিতে লেখাপড়া করেন। এক সময় বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তার লেখা প্রবন্ধের জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে কারণ দর্শাতে বললে তিনি পদত্যাগ করে ভারতে চলে যান। ভারতে তিনি Indian Council for Cultural Relation এর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। All India Radio এর নয়াদিল্লী, পাটনা, কটক শাখায় কর্মরত ছিলেন। বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন; ফ্রেঞ্চ, জর্মান, ইটালিয়ান, আরবী , উর্দু , পার্শী ইত্যাদি সহ পনের-ষোলটি ভাষা জানতেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় প্রয়াত হন। দেশেবিদেশে, চাচা কাহিনী, চতুরঙ্গ, পঞ্চতন্ত্র, টুনি মেম ইত্যাদি বহুগ্রন্থের রচয়িতা। গত শতকের শেষ দিকে স্কুলের সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষক পন্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। কাব্য, দর্শন, অলংকার ইত্যাদিতে তারা যথেষ্ট পারদর্শী হলেও অনেক স্কুলে তারা বেতন পেতেন স্কুলের দফতরির চেয়েও কম। এরকম এক পন্ডিতকে নিয়ে লেখা একটি মর্মস্পর্শী গল্প আছে মুজতবা আলীর রম্য রচনার বই "চাচা কাহিনী"তে। গল্পের শেষাংশ এ রকম-(লাট সাহেবের এক স্কুল পরিদর্শন শেষে ছুটির পর স্কুল বসেছে।)

সৈয়দ মুজতবা আলি

"পন্ডিত মশাই শুধালেন 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বলে তো রে।' আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলাম। চাপরাসি নিত্যানন্দকেও বাদ দিলাম না। 'হ'ল না। আরে কে ছিল?' বললুম 'ঐ যে বললাম, এক গাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু ছিলেন। তারাতো ক্লাসে ঢোকেনি'। পন্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরও গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ? আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিলনা পন্ডিতমশাই; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।' পন্ডিতমশাই হটাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁত মুখ খিঁচয়ে বললেন, 'ও উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ,--রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সাহেবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে -' আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হা হা দেখেছি। ও তো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকে ছিল।' পন্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে আবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো? ভাগ্যিস মনে পড়ল, বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছিল। হু! বলে পন্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'শোন, শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরীতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকার মাঝি এক অপরিচিতের সংগে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তি টুপি। আমাকে অনেক সালাম-টালাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বারউল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সংগে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দেই।' পন্ডিত মশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটা উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করেন আর সকলকে অকাতরে লিফট দিতেন। পন্ডিত মশায় বললেন 'লোকটার সংগে কথাবার্তা হল, লাট

সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরের একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল’। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন ‘আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আট জনা।’ তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মদনমোহন কি রকম অঙ্ক শেখায়রে? মদনমোহন বাবু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার– পন্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললাম ‘ভালই পড়ান’। পন্ডিতমশাই বললেন ‘বেশ বেশ। তবে শোন। মিস্বারউল্লার শালা বলল ‘লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে ৭৫টাকা খরচ হয়। এইবার দেখি, তুই কি রকম অঙ্ক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পিছনে মাসে ৭৫ টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের যদি তিনটে ঠ্যাং হয়, তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?’ আমি ভয় করছিলুম পন্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতড়ি বললুম, আজ্ঞে ২৫টাকা। পন্ডিত মশাই বললেন, ‘সাধু, সাধু’। তারপর বললেন, ‘উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধামাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আট জন, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি পাই ৭৫ টাকা। বলতো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাটসায়েবের কুকুরের ক’টা ঠ্যাঙের সমান?’ আমি হতবাক। ‘বল না’। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।পন্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন “উত্তর দে” মূর্খের মত একবার পন্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে। ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে- কেউ বাদ যায়নি- পন্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে। পন্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কতক্ষণ পরে ক্লাসের ঘন্টা বেজেছিল আমার হিসাব নেই। এই নিস্তব্ধতার নিপিড়ণস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। ‘নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়’ ‘Silence is golden’ যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলা পাই।

খেলা- ধুলা:

বাংলাদেশ পাকিস্তান ক্রিকেট সিরীজ- ২০১৫

ওমর খালিদ রুমী

এপ্রিল সে মাসের এই সিরীজ আমাদের জন্য অনেকটা অম্ল- মধুর স্বাদ এনে দিল। অর্থাৎ আমরা যে রকমটা ভেবেছিলাম সেরকমটা হল না। সিরীজের প্রথম দিকটায় আমরা বেশ ভালভাবে উৎড়ে গেলাম কিন্তু শেষে এসে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। আসলে এটাই ক্রিকেট । এভাবেই উত্থান পতন সব সময়েই লেগে থাকবে । এর মধ্যে থেকেই আমাদের উন্নতি করতে হবে। উন্নতি যে কিছুটা এর মধ্যেই হয়নি তা বলব না।

ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের উচ্ছাসিত পারফর্মেন্স কিন্তু আমাদের অনেকটা সাহস জুগিয়েছে। অস্ট্রেলীয়ার দুরন্ত পিচেও আমরা ভাল করার পরে নিজের দেশের মাটিতে নিজেদেরেকে পুরোপুরিভাবে মেলে ধরতে পেরেছি। তাই একদিনের খেলাগুলোয় জয় পেয়েছি। টেষ্টেও আমাদের ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাকিস্তানের মত অত্যন্ত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে।

এপ্রিলের ১৫ তারিখে প্রথম খেলা । ৫০ ওভারের ম্যাচ। বিসিবি একাদশ বনাম পাকিস্তান একাদশ। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬৮ করে বসে ৯টি উইকেট খুইয়ে। হাফিজ একাই করেন ৮৫। হোম ৩টি উইকেট দখল করে বাংলাদেশের পক্ষে। বিসিবি একাদশ সাব্বিরের অনবদ্য ১২৩ রানে ভর করে শেষ পর্যন্ত ৯টি উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করে ফেলে। জুনায়েদ ৪টি উইকেট নিলেও বিসিবি একাদশ শেষ পর্যন্ত জয় পেয়ে যায়।

প্রথম ওয়ানডে ১৭ই এপ্রিল। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ৬টি উইকেট খুইয়ে ৩২৯ রান করে ফেলে। তামিম অনেকদিন পর আবারো এদিন ১৩২ টি রান করে বসে। ওয়হাব রিয়াজ ভালো বোলিং করে ৪টি উইকেট দখল করেলেও কোন লাভ হয় নি। পাকিস্তান ব্যাট করতে নেমে কিন্তু তেমন সুবধিা করতে পারলোনা । তাসকিন দুর্দান্ত বোলিং করে ৩টি উইকেট নিয়ে নিলে পাকিস্তানের ২৫০ রানে ইনিংস শেষ

হয়ে যায়। এপ্রিলে ১৯ তারিখে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করল, সহজ উইকেটেও পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা তেমন সুবিধা করতে পারলো না। ২৩৯ রানেই ওদের ইনিংস গুটিয়ে গেল। সোহেল আর আজহার যথক্রমে ৩০ ও ৪৪টি রান দিলেও ইউনুস মিসবাহ্‌র কাছ থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। শেষমেস নাসিম ৭৭ আর ওয়হাব রিয়াজ ৫১ নিয়ে হাল না ধরলে আরো কম রানেই ওদের ইনিংস শেষ হয়ে যেত। মাশরাফী, সাকিব, রুবেল বেশ ভাল বোলিং করেই ওদের আটকে দিল। জবাবে বাংলাদেশ ৩টি উইকেট খুইয়ে ২৪০ রান অনায়াসে করে ফেলল। তামিম আবারো নতুন ভাবে নিজেকে উন্মোচিত করে ১১৬ টা সুন্দর রান উপহার দিল। মুশফিকও স্বাভাবিক ভাবে খেলে ৬৫ রান করল। তৃতীয় ওয়াড্ডে এপ্রিলের ২২ । এদিনও পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ২৫০ রান করল। এদিন অবশ্য আজহার ১০১ রানের একটা চমৎকার ইনিংস খেললেন। সংঙ্গে সামী ৪৫ আর সোহেল ৫২ রান করায় পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হল ২৫০এ।

মাশরাফী, রুবেল, সাকিব, আরাফাত প্রত্যেকেই ২টা করে উইকেট পেলো ভাল বোলিং করে।

বাংলাদেশ অনায়াসে মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে ঐ রান তুলে ফেলল (২৫১-২)। তামিম ৬৪ রানে এসে থেমে গেলেও সৌম্য ১২৭ টি রান তুলে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেল। মুশফিক সংঙ্গে থেকে ৪৯ রান যোগ করলে ২৫০ রান পেরোতে বেগ পেতে হল না।

পরের ম্যাচ ছিল টি-টুয়েন্টি। ২৪ শে এপ্রিল। এদিন অবশ্য পাকিস্তানের স্কোর মোটামুটি একটা অবস্থানে এসে দাড়ালো। মুকতার ৩৭ আর সোহেলের ৩০ রানের উপর ভর করে ওদের মোট রান এসে ৫ উইকেট ১৪১ এ ঠেকল। জবাবে বাংলাদেশ সেষ পর্যন্ত ৩টি উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে ফেলল। সাকিব এদিন ভালো খেলে ৫৭ রান করল। সাব্বির করল ৫১।

এর পরে ২৭ সে এপ্রিল খূলনায় প্রথম বারের মত প্রথম টেষ্ট ম্যাচ শুরু হল।

বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৩৩২ এর একটা মোটামুটি স্কোর দাড় করালো । পিচ কিছুটা মন্থর থাকায় ব্যাটসম্যানদের জন্য কিছুটা হলেও সুবিধা হল। ইমরুল ৬৭, তামিম ২৫, মোমিনুল ৮০, মাহামুদুল- াহ ৪৯ ও মুসফিক ৩২ রান করল।

পাকিস্তানের ইয়াসীর লেগ স্পীন করে একাই ৩টি উইকেট দখল করলেন। পাকিস্তানী ব্যাটসম্যানরা স্পীন উইকেটের সদ ব্যবহার করলেন

পুরোপুরি। মোট ৬২৮ রানের মধ্যে হাফিজ একই ২২৪ রান করে ফেললেন। আজহার আলী ৮৩, মিসবাহ ৫৯, আসাদ শফিক ৮৩ ও সরফরাজ ৮২ করায় বিশাল রানের পাহাড় গড়ে উঠল। বাংলাদেশ দলের বাঁ হাতি স্পিনার তাইজুল ১৬৩ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নিলেও তেমন সুবিধা হল না। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা সুন্দর ভাবে ধৈর্য্য ধরে খেলে ৬টি উইকেট হারিয়ে ৫৫৫ রান করে ফেলল। তামিম ২০৬ আর ইমরুল ১৬০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে বিশাল জুটির রেকর্ড করে ফেলল। বাংলাদেশের জন্যে সর্বপ্রথম। ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ড্র এর দিকেই গেল। মিরপুরে দ্বিতীয় টেষ্টে বাংলাদেশ টসে জয় পেয়েও কেন ফিল্ডিং নিল সেটা বোঝা গেল না। পিচ যে বোলিংয়ের পক্ষে সেটা কিন্তু মনে হল না। ফলে

পাকিস্তান ৮ উইকেটে ৫৫৭ রান করে ইনিংস ঘোষনা করল । এদিন আজহার সংহার মূর্তি ধারন করে ২২৬টি রান করে ফেললেন। ইউনুস ১৪৮, আসাদ শফিক ১০৭ রানের সুন্দর ইনিংস খেললেন। বাংলাদেশের বোলাররা পেস ডিপার্টমেন্টে বোলার কম হওয়ার ফল ভোগ করল। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা প্রথম টেষ্টের মত পারফরমেন্স যেমনটা আশা করা গিয়েছিল তার ধারে কাছেও যেতে পারল না। মাত্র ২০৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে গেল। সাকিব ৮৯, ইমরুল ৩২ ও মাহামুদুল্লাহ ২৮টি রান দিতে পারল। এদিন আবারো পাকিস্তানী লেগ স্পীনার ইয়াসীর ৩টি উইকেট নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন । মিসবাহ বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বার ব্যাটিং না করিয়ে নিজেরাই ব্যাটিং করলেন আর শেষ পর্যন্ত ৬টি উইকেট হারিয়ে ১৯৫ টি রান করে ইনিংস ঘোষনা করলেন। আমরা কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও দাঁড়াতে পারলাম না। মাত্র ২২১ রানে ইনিংস শেষ হয়ে গেল। মমিনুল ৬৮, তামিম ৪২ আর হোমের ৩৯ রানই ছিল সর্ব্বোচ্চ। পাকিস্তানের লেগ স্পীনার এবারও দুর্দান্ত বোলিং করে ৪টি উইকেট দখল করলেন বাংলাদেশের দুর্গতি চুড়ান্ত হল। বাংলাদেশ ৩২৮ রানে হেরে গেল।

একটা কথা আছে “সব ভালো যার শেষ ভালো” । আমাদের বেলায় ঠিক উল্টোটাই হল । ভাল ভাবে শেষ করতে পারলাম না। কারন সত্যিকারের ভাল বোলিংয়ের সামনে আমরা কুকড়ে গেলাম। এটাই আমাদের সমস্যা। টেকনিক্যাল সাইডটা আরো উন্নত করতে হবে। প্রথম টেষ্ট যে ভাবে খেলেছি সেরকম করে খেলতে পারলে তবেই বলতে পাবো আমরা যে কোন টেষ্ট প্লেইং ন্যাশনের সংঙ্গে একই কাতারে আছি। স্পীন বোলিংয়েও আমাদেও দুর্বলতা রয়েছে। টিম সিলেকশন ঠিক হয়নি। সেটাও ঠিক করতে হবে। আমাদের আরো কিছুটা বাকী। আশা করি সব সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে উঠব খুব শিগগীরই।

মধুবালা

বিনোদন:

সিনেমা তারকাদের দাম্পত্য বয়সের ফারাক নিয়ে কিছু কথা পাঠকদের জানাতে চাই। দম্পতীর বয়স ৫/৭ বছরের ফারাক স্বাভাবিক, মেয়ের বয়স কম হলেও তারা মনের বয়সে ছেলেদের থেকে এগিয়ে থাকে বলে বিবাহিত জীবনে সমান সমান, ফলে বয়স কোন সমস্যা তৈরি করে না। বয়েসের তফাৎ ২০/২৫ হলেও কি সমস্যা হয়! ঠিক জানা না গেলেও কিছু সিনেমা দম্পতিদের ক্ষেত্রে নিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ঢাকা সিনেমার বিখ্যাত নায়ক-গায়ক-পরিচালক খান আতাউর রহমান ১ম স্ত্রী মাহবুবা রহমানের সাথে ছাড়াছাড়ির পর বিয়ে করেন তার চেয়ে ২৪/২৫ বছরের ছোট সংগীত শিল্পী নিলুফার ইয়াসমিনকে। খান আতা এবং নীলুফার ইয়াসমিন দীর্ঘ দিন ঢাকা সিনেমা অঙ্গনকে মাতিয়ে রাখেন। তাদের একটি সন্তান আগুন, সেও ভাল গান করে। খান আতা দম্পতি প্রয়াত। তারা জীবত কালে সুখী ছিলেন। বলিউড সিনেমা অঙ্গনে বয়সে বিস্তর ফারাক দম্পতির সংখ্যা অনেক। দু চার জনের কথা বলছি। প্রথমেই ইউসুফ খান বা দীলিপ কুমার। চল্লিশের দশক থেকে দাপটের সাথে অভিনয় শুরু করে কিছুদিন আগ পর্যন্ত অভিনয় করে চলেছেন। মধুবালা, বৈজয়ন্তীমালার সাথে প্রেম কাহিনীর গুঞ্জনের পর ৪৪বছরের দীলিপ কুমার বিয়ে করলেন তার চেয়ে২৩ বছরের ছোট সায়রা বানুকে। অনেকেই রসিকতা করে বলেন সায়রা তার শেষ বয়সের ছড়ি। তবে তারা যেসফল দম্পতি তা অনেকেই স্বীকার করেন। বিখ্যাত নায়ক রাজেস খান্না ডিম্পল কাপাডিয়াকে বিয়ে করেন ৩১

বছর বয়েসে। ডিম্পল তখন মাত্র ১৬ বছরের। এই বিয়ে টেকেনি বেশীদিন। ডিম্পল অভিনয় ছেড়ে সংসারে মন দিলেও এক দিন দুই মেয়েকে নিয়ে তাকে খান্নার সংসার ছেড়ে যেতে হয়। পরে আবার অভিনয়ে ফিরে এলেও ডিম্পল আর সংসার করেন নি; রাজেস খান্নাও আর বিয়ে করেননি। মনে হয় তাদের সংসার সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ বয়সের ব্যবধান ছাড়াও অন্য অনেক কিছু হতেপারে। ধর্মেন্দ্র- হেমামালিনী দম্পতির বয়সের ব্যবধান ১৩ বছরের যখন তারা বিয়ে করেন। চার সন্তানের বাবা ধর্মেন্দ্র শোলে ছবিতে অভিনয় করার সময় সে সময়ের ‘ ড্রিম গার্ল’ হেমামালিণীর সাথে প্রেম হয়। বেশ কয়েক বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর ৪৫ বছর বয়েসে ধর্মেন্দ্র লুকিয়ে বিয়ে করেন ৩২ বছারের হেমাকে। তাদের সংসার এখনও সুখের। সাইফ আলী খনের ব্যাপারটা ছিল উল্টো। তার ১ম বৌ অমৃতা সিং এর বয়স ছিল তার চেয়ে ১২ বছর বেশী। ১৩ বছর সংসার করার পর তারা আলাদা হয়ে যান২০০৪ সালে। এর ওর সাথে জুটি বাধার অসফল চেষ্টার পর অবশেষে ২০১২ তে বিয়ে করেন তার চেয়ে ১১ বছরের ছোট কারিনা কাপুরকে। বিয়ের পর তারা সুখেই আছেন যানা যায়। পাঠক, দম্পতির বয়েসের তফাৎ কি সুখ অসুখের কারণ হতে পারে? ঠিক বলা যায় না। তবে দাম্পত্য সুখের বিষয়ে একজন বলেছেন- Marriage is nothing but compromise and adjustment. এটাই বোধ হয় ঠিক।

রাজেশ খান্না

বৈজয়ন্তীমালা

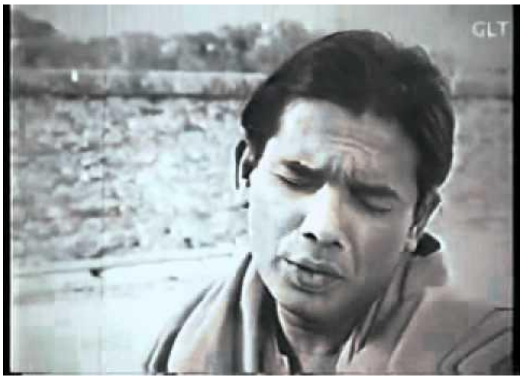

খান আতাউর রহমান

ডিম্পল কাপাডিয়া

কবিতা

মায়া

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান খান

ভাবি না আর কো
ন-জনের কথা
এই দুনিয়ার. . .
একা শুধু, তুমিই একা
রয়েছ আমার হৃদয়ে, রয়েছ আমার হৃদয়ে
ভাবি না আর কোন-জনের কথা ।

আমি ছাড়া তুমি একা
তুমি ছাড়া আমি একা
এ কথা ভেবে মনটা কেঁদে উঠে
যখনই ভাবি একা একা
চলে যাব ছেড়ে কায়ার মায়া
তখনই ভুলে যাই
ভেবে তো পাই না - কোন কিনারা
কেন বিধাতা দিলেন মায়া
ভাবি না আর কোন-জনের কথা

এ সংসারের সাধুজন
কি পেয়েছে কখন ।
তাতো জানি না
ভাবি না আর কোন-জনের কথা ।

এ সংসারের কিছুই তো নয় আমার
রবে নাতো কিছুই কারো
তবু ও পিছু চলি মায়ার টানে
বিধাতার এ কোন খেলা
ভাবি না আর কোন-জনের কথা
এ দুনিয়ায়. . . . .

মাহে রমজান

হায়াত মাহমুদ

চাঁদ উঠেছে, নীল্ আকাশে-
শাবান মাসের শেষে,
তাইতো আমার মন্টুটে যায় -
চাঁদ-তাঁরার দেশে ।

এসো মুমিন, আললাহর কাছে-
চাইবো সবাই পানাহ,
মাগফেরাতের -ভালো সময়,
ক্ষমা হবে সব গুনাহ ।

সাগর-নদীর কুল-কিনারায়-
ভেসে ফেনা আসে,
রমজানের এই বরকত মাসে
পাপ চলে যায় ভেসে ।

ভাগ্যে হয়তো আর হবে না-
এই মাসের ছোঁয়া
এখনও যারা বেঁচে আছি-
একটু মাথা নোয়া ।

শোনো মুমিন-মুসলমান-
কেদে কেদে বল,
ভুল করেছি মাফ করে দাও-
ফেলে, চোখের জল ।

ঈদ হউক সবার

হায়াত মাহমুদ

নিয়তি ওদের তাড়া করে ফেরে-
ওরা যে, পথের ছেলে,
সর্বশান্ত হয়ে গেছে আজ-
অবহেলাই শুধু মেলে।

দুঃখ পেলেও কাঁদেনা ওরা-
অশ্রু গেছে শুকিয়ে,
ওদের জীবনেও ঈদ আসে-
ফুটো থালা হাতে নিয়ে।

সামাজিকতায় শেষের কাতারে-
সদাই থাকতে হয়,
তাদেরও আছে, ঈদের আনন্দ-
ছেড়া জামায়, ঈদ হয়।

ঈদের দিনেও অন্ন জোটে না-
উদাম গায়ে, অনেক কষ্ট,
কেউবা করছে খাদ্য অপচয়-
করছে অর্থ নষ্ট।

ঈদের দিনেও গাছের তলায়-
ঘুমানোর ঠাঁই হয়,
ভুলে যেওনা, তাদেরও জীবন-
মানুষ, তাদেরও কয়।

সুবচন এখন অনলাইনে!
সুবচনে প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন এবং ছবি ঘরে বসে পেতে লগ অন করুন
www.sydneybashi-bangla.com

Medical Centre in Lakemba

Medical Centre in Lakemba urgently requires GP doctors (VR or nor-VR) to start ASAP full time or part time

Contact H Khan on

Mobile: 0405 305 024 or
E-mail: hiks250@gmail.com
for more information

Narrow upper jaw and expanders. What? Why? When is the best time to start orthodontic treatment?

- By Dr Andrew Chang, orthodontist, Smiles & Faces Orthodontics, Blacktown. Ph: 02-8814-9941

Over the past few weeks, I have seen a few instances of narrow upper jaws in adult, teenagers and children. I wanted to talk about this as treatment approaches vary depending upon age. This is 1 form of treatment where managing the orthodontic treatment is best undertaken by the mid-teens or earlier.

Narrow upper jaw. What does this mean?

This refers to a condition where the upper jaw is very narrow (see picture below).

Another sign of this is where most of the top side teeth are biting inside of the lower side teeth (see picture below).

Often when one smiles from the front, the smile appears narrow rather than broad and spaces can be seen on the side of the smile, rather than where the teeth should be.

Why is this a problem?

The upper jaws are connected with the nose and in children with narrow upper jaws, the nose passages are smaller. A common answer from parents is their child tends to breathe through the mouth, or snore at night, or wakes up in the morning with a dry mouth due to mouthbreathing.

A simple test would be to ask your child to close their mouth and breathe through their nose for 20-30 seconds. If you are able to hear distinct heavy breathing through their nose, it may be an indication of their mouthbreathing habit.

Can chronic mouthbreathing affect my child's bite?

Studies in animals and growing children have also confirmed that this may affect jaw growth, leading to a large overbite and small chin developing.

How does age of the patient affect orthodontic treatment approaches?

The younger the patient, the greater the success with upper jaw expansion. Having said this, as an orthodontist, if commencing treatment early, we have to balance this against the future need of orthodontic treatment, in addition to considering how the patient and parent feels about the proposed treatment approach. There also needs to be sufficient teeth present to support the expander appliance.

In children and teenagers, a common approach is an upper fixed expander plate to widen the upper jaw.

The following picture below of one of our treated patients show the effect of expander treatment and upper and lower braces can have in enhancing one's smile.

Before expanders and braces

After expander and braces

In adults, treatment approaches to correct a narrow upper jaw, increase in complexity, costs and discomfort, compared to the teens and children. This can often involve some form of jaw surgery in adults, should they seek its correction.

So if you have any doubts on when is the best time to start orthodontic treatment, see an orthodontist to have a consultation soon. At the very least, you will have peace of mind knowing when is the best time to start after taking into consideration all factors.

সিডনীতে বাংলাদেশ সোসাইটির দোয়া ও ইফতারের আয়োজন

কাজী সুলতানা (Seeme)

গত ২৮শে জুন রোববার সিডনীর রকডেল পাবলিক স্কুলে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সিডনী ইনক এর পবিত্র রমজান উপলক্ষে এক দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সিডনী গত দশ বছর যাবত অস্ট্রেলিয়ায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা প্রচলিত রাখার একনিষ্ঠ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই সংঘঠনটি প্রবাসে বেড়ে উঠা প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও কৃষ্ঠি অনুশীলন ও অনুপ্রেরণার জন্য নানা উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। আর এরই ধারাবাহিকতায় রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

বিকাল ৪.৩০ মিনিট থেকে সংঘটনটির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাধারণ সদস্য, অতিথি, বন্ধু-বান্ধব ও তাদের পরিবার বর্গ সমবেত হয় রকডেল পাবলিক স্কুল মিলনায়তনে। প্রত্যেকের আন্তরিক সৌহার্দ ও সহযোগিতায় শুরু হয় ইফতার প্রস্তুতি ও দোয়ার আয়োজন। ইফতার শেষ করার পর সমবেত ভাবে জামাতে মাগরিব এর নামাজ আদায় করা হয়। এতে বাচ্ছারাও এক সাথে নামাজ আদায়ে শরীক হয়। এ ছিল ইসলামী আদর্শ পালনের এক অপূর্ব সম্মেলন। বলা বাহুল্য মহিলাদের জন্য ও আলাদা জামায়েতের বাবস্থা করা হয়। নামাজ শেষে ইসলামিক আলোচনা ও দোয়া পড়ানো হয়।

ইফতার মাহফিল ও দোয়ার পর ডিনারের আয়োজন করা হয়। রমজানের শুভেচ্ছা ও ইসলামী আদর্শ অনুশীলনের প্রয়াস সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সিডনীর এই আয়োজন। আয়োজকদের প্রধান পৃষ্টপোষক জনাব শহিদুজ্জামান আলো বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সিডনী গত দশ বছর যাবত নানা উদ্যোগ ও গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে উঠা প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে বন্ধন তৈরি করতে ও দেশীয় প্রভাব সমুন্নত রাখতে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তার প্রতিরূপ ও উদ্যোগের ফলে রকডেল বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা, সেখানে প্রতি রবিবার বাংলাদেশী বাচ্ছাদের বাংলা শেখার বাবস্থা করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশী সংস্কৃতির যথাযথ পরিচ্চার জন্য নানামুখী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আগামী ৩রা অকটোবর সিডনীতে সংঘঠনটি একটি বসন্ত মেলার আয়োজন করেছে।

রকডেল পাবলিক স্কুলের এই ইফতার মাহফিলে সিডনীতে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা ও যোগদান করেন। সংঘঠনটির সভাপতি সোহেলুর রহমান, সম্পাদক আফসানা বিলকিস, কোষাদক্ষ আবু হাসানাত সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতায় অত্যান্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় বাংলাদেশ সোসাইটি অফ সিডনীর ইফতার মাহফিলের এই বিশেষ আয়োজন।

Quakers Hill Mosque Quran Lessons for Children

Lessons on weekdays

Qualified male and female teachers availan ble

We also have afternoon and evening classes for girls and ladies

Please contact –

Sherin 0408041491

Dr Maha 0402659788

How to make Tiramisu

By Mithila Zaheen
Adapted from
www.taste.com.au

Ingredients

- 2 cups strong black coffee
- 3 eggs, separated
- 1/3 cup caster sugar
- 250g mascarpone cheese
- 300mL thickened cream, lightly whipped
- 1 large packet of Savoiardi sponge fingers
- Cocoa, for dusting

Method

1. Pour 2 cups of strong black coffee into a shallow dish. Set aside.
2. Beat 3 egg yolks and sugar in a large bowl with an electric beater until pale and thick. Add the mascarpone and whipped cream, mixing gently until combined.
3. Beat egg whites in a medium bowl with an electric beater until soft peaks form. Using a large metal spoon, gently fold egg whites into the mascarpone mixture.
4. Dip enough biscuits into the coffee mixture to cover the base of the dish you are using. Cover the biscuits with 1/3 of the mascarpone mixture. Repeat layers 2 times, ending with the cream. Cover with plastic wrap and refrigerate for at least 2 hours.
5. Dust generously with cocoa and serve.

Chief Editor: Tofazzal Hossain Sarker
Editor: Dr Tamanna Parvin
Co-editors: Fardin Ferdous, Mithila Zaheen, Sarita Alam
Publication Editor: Sherwan Zaman
Email: tparvin2@yahoo.com.au

রমজানের পর ভাল কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার দশটি মাধ্যম

আফরোজা হোসেন

১। রমজানের পর ভাল কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সর্ব প্রথমে হেদায়েত এবং দৃঢ়তার উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করতে হবে।

হে আমাদের রব, আপনি হেদায়েত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (সূরা আলে-ইমরান ৮ আয়াত)

২। ভাল লোকদের সাথে বেশি উঠা বসা করতে হবে, এবং ওয়াজ নছিহত ও বিভিন্ন ধরণের দ্বীনি আলোচনা যেখানে হয় সেখানে যাতায়াত করতে হবে।

৩। বই পত্র পড়া এবং ক্যাসেট শ্রবনের মাধ্যমে নেক লোকদের জীবনী জানা, বিশেষ করে সাহাবাদের জীবনী জানা। কেননা এর মাধ্যমে মনের ভিতর সাহস ও আশার সঞ্চার করা।

৪। বেশি বেশি করে প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামি ক্যাসেট শ্রবণ করা: যেমন ভাল ভাল খতীবদের আলোচনা ওয়াজ যেখানে পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করা।

৫। ফরজের প্রতি যত্নশীল থাকা যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা কোন কারণে কাজা হয়ে থাকলে তা দ্রুত আদায় করা।

৬। নফলের প্রতিও যত্নশীল হওয়া যদিও তা কম হয়, কেননা আল্লাহর নিকট ঐ আমল অধিক প্রিয় যা নিয়মিত হয় যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

৭। অর্থ সহ কোরআন তিলাওয়াত করা। কোরআন হেফয করতে আরম্ভ করা এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা, আর যা হেফয করবে তা ফরজ নামাজে এবং নফল নমাজে পড়তে অভ্যাস গড়ে তোলা।

৮। বেশি বেশি জিকর ও ইস্তেগফার করা, কেননা এ কাজটি সহজ কিন্তু তার উপকার অনেক বেশি, ঈমান বৃদ্ধি করে এবং মন ও হৃদয়-কে শক্তিশালী করে।

৯। এমন কিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা যা হৃদয়কে নষ্ট করে দেয়, যেমন অসৎ লোকের সঙ্গ, অশ্লীল গান শোনা, অশ্লীল অনুষ্ঠানে যাওয়া, অশ্লীল চিত্র দেখা ইত্যাদি।

১০। সর্বশেষ আমাদের দ্রুত তওবা করতে হবে। খালেছ তওবা। যেখান থেকে আর পিছনে ফিরার চিন্তা ও আসবেনা। আল্লাহ তাআলা বান্দা তওবা করলে অত্যন্ত খুশি হন। **আমরা ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবনা যারা আল্লাহকে রমজান ছাড়া অন্য সময়ে চিনেনা।** আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

বাংলাদেশীদের মধ্যে আমরাই প্রথম... আমরাই এগিয়ে।

গুনে ও মানে অদ্বিতীয়

সম্পূর্ণ আধুনিক আর অভিনব প্রযুক্তিতে

SHARP FUJI xerox Roland সহ

Canon
imaging across networks

এখন আমাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

আমরাই দিতে পারি সবচেয়ে কমমূল্যে
আপনাদের সর্বপ্রকার প্রিন্টিং এর নিশ্চয়তা

স্পেশাল আকর্ষনঃ **Personalized Wall Calendar for your Business (any quantity)**

We Do all kinds of printing More over Banner, Poster, Large Format, Plan, T-Shirt, Cap and many more....

A1 INSTANT PRINTING

T: 02 9565 2301 M: 0412 286 033
E: printer@a1instantprinting.com.au
w: a1instantprinting.com.au
7-9 Addison Road,Marrickville, NSW 2204